চলচ্চিত্র শিল্পী আবদুস সামাদ

জীবন ও কর্ম

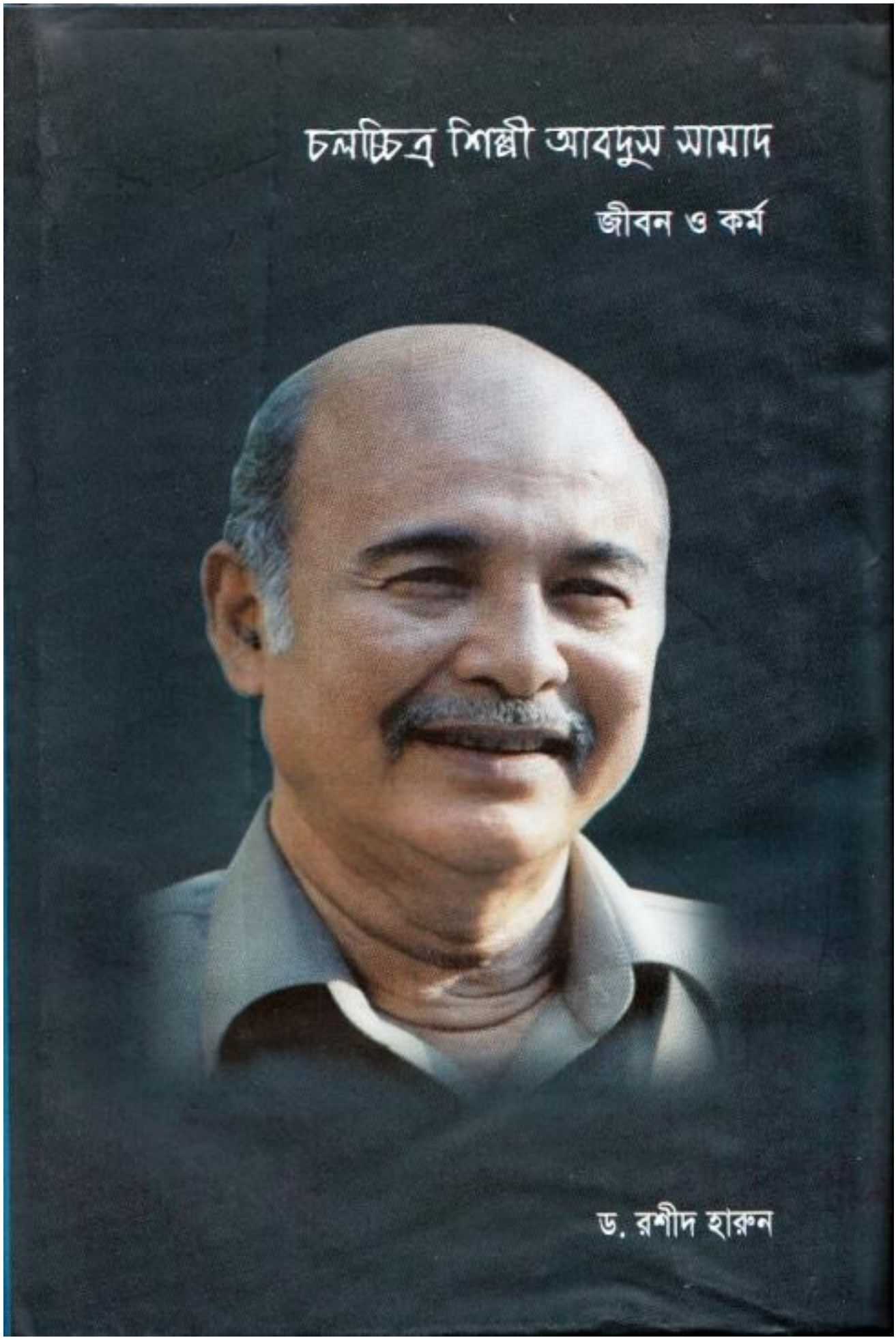

ড. রশীদ হারুন

চলচ্চিত্র শিল্পী আবদুস সামাদ : জীবন ও কর্ম

ড. রশীদ হারুন

পাণ্ডুলিপি

লাইব্রেরি শাখা, বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
মহিউদ্দিন ফারুক

প্রকাশক
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ
তথ্য মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গ্রন্থস্বত্ব
বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

প্রচ্ছদ
মো. মোস্তফা কামাল ভূঁইয়া

মুদ্রণ
তিথী প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ঢাকা

প্রথশ প্রকাশ

জুন, ২০১২, আষাঢ়, ১৪১৯ বাংলা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Abdus Samad : Biography and works by Dr. Rashid Harun
First Edition : June, 2012

ISBN : 978-984-33-5815-8

উৎসর্গ

অকালপ্রয়াত সিনেমাপ্রেমি অগ্রজ নূরে আলম বাবু (১৭ নভেম্বর ১৯৫৩-১৪ জুন ২০০৬)-র স্মৃতির উদ্দেশ্যে।

যে হতে পারতেন দেশের খ্যাতিমান ফটোগ্রাফার কিংবা সিনেমাটোগ্রাফার। আরো কত কী-ই না হতে পারতেন! অথচ কোন সে বোধ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে আমৃত্যু?

---------- শান্তিতে থাকো ভাই আমার ঐ নক্ষত্রলোকে!!

ভূমিকা

চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রাহক হিসেবেই আমরা জানি এম আবদুস সামাদকে। কিন্তু ড. রশীদ হারুন এর গবেষণাপত্রটিতে প্রয়াত এ চলচ্চিত্রশিল্পীর বর্ণিল জীবনের যে দ্যুতি ছড়িয়েছে তা আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। কি করেননি তিনি! মাত্র সাতষট্টি বছরের জীবনের ব্যপ্তিতে তেতাল্লিশ বছরই কর্মজীবন। এ কর্মজীবনে অভিনয়, চলচ্চিত্র নির্মাণ, চিত্র গ্রহণ, চিত্রনাট্য রচনা, চলচ্চিত্র শিক্ষক, চলচ্চিত্র শিক্ষার জন্য একাধিক অধ্যায়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ চলচ্চিত্রের প্রতিটি শাখায় সৃজনশীলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। শিল্পমনস্ক মননশীল শুদ্ধ চেতনার চলচ্চিত্রকলার এ শিল্পী বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের এক অনন্য সম্পদ। ড. রশীদ হারুন 'চলচ্চিত্রশিল্পী এম আব্দুস সামাদ: জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গবেষণা গ্রন্থের পরতে পরতে তাঁর সৃজনশীলতার পরিচয় তুলে ধরেছেন।

প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ চলচ্চিত্র বিষয়ে ফেলোশিপ প্রদান অব্যাহত রাখে। এর মূল উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভকে চলচ্চিত্র সংরক্ষণের পাশাপাশি চলচ্চিত্র অধ্যয়ন ও গবেষণার অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা। এ কার্যক্রমের আওতায় ২০১০-১১ অর্থ বছরে ড. রশীদ হারুন 'চলচ্চিত্র শিল্পী এম আব্দুস সামাদ: জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গবেষণাপত্রটি আর্কাইভ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হয়। চলচ্চিত্র শিল্প বিশেষ করে চিত্রগ্রহণ কুশলতা ও চলচ্চিত্র পরিচালনা সম্পর্কে জনাব সামাদের অবদান যা বহুমাত্রিকায় সমুজ্জল তা চলচ্চিত্র পাঠক ও গবেষককে আকৃষ্ট করবে সন্দেহ নেই। গবেষণাপত্রটিতে জনাব সামাদের ব্যক্তিগত জীবন যেমন উঠে এসেছে তেমনি তাঁর কর্মজীবনের নানা দিক, তাঁর নিজস্ব রচনার চৌম্বক অংশ এবং তাঁর বেশ কিছু স্থিরচিত্র স্থান পেয়েছে। গবেষণাপত্রটি একটি নির্দিষ্ট ছকে উপস্থাপন করা হলেও গ্রন্থাকারে প্রকাশের লক্ষ্যে লেখক পরিমার্জন করেছেন যা পাঠককে আকৃষ্ট করবে।

অত্যন্ত যত্ন নিয়ে গবেষণাপত্রটি তত্ত্বধান করেন আরেক গুণী চলচ্চিত্র শিল্প নির্দেশক ড. মহীউদ্দিন ফারুক। নেপথ্যে থেকে সহযোগিতা করেছেন ফিল্ম আর্কাইভের পরিচালক মো: জহির আহমদ, প্রকল্প পরিচালক মো: সরওয়ার আলম, উপ-প্রকল্প পরিচালক মো: নিজামূল কবীর, লাইব্রেরিয়ান মো: নজরুল ইসলাম ও কম্পিউটার অপারেটর মো: ফজলে রাব্বী। পরিশেষে গ্রন্থটি পাঠক প্রিয় হলে আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

কামরুন নাহার

মহাপরিচালক

সূচিপত্র

প্রাক কথন ix

প্রথম অধ্যায় : ব্যক্তি জীবনের রূপরেখা ১-৩৮

১. শৈশব কৈশর ও পরিবার পরিজন ২. অধ্যয়ন/প্রস্তুতিপর্ব : চলচ্চিত্র শিক্ষা ও বিশ্ববীক্ষণ ৩. স্বদেশ প্রত্যাবর্তন : কর্মজীবন-প্রথম পর্ব ৪. সামাদ যখন অভিনেতা ৫. চাকরি নয়-পছন্দ মুক্ত পেশা ৬. প্রেম পরিণয় ৭. চিত্র পরিচালনার প্রথম প্রয়াস : অপূর্ণ স্বপ্ন-১ ৮. চলচ্চিত্র নির্মাণ : দ্বিতীয় প্রয়াস আইল ভাঙার কাব্য ৯. মুক্তিযুদ্ধ ও আবদুস সামাদ ১০. *ওরা ১১ জন* এবং আবদুস সামাদ ১১. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র চিত্রগ্রাহক সমিতি গঠন ১২. বাংলাদেশের চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের সদস্য ১৩. নতুন পথ : চলচ্চিত্র পরিচালনা ১৪. মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব ও *সূর্য সংগ্রাম* বিতর্ক ১৫. 'সুখী দম্পতি' সমাচার/সুখের ঘরে লাগলো আগুন ১৬. সামাদের অপূর্ণ স্বপ্ন-২ ১৭. অতঃপর নির্বাসন ১৮. অন্যান্য ১৯. পুরস্কার, সম্মাননা ইত্যাদি ২০. শেষের যাত্রা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : চিত্রগ্রহণ শিল্পী সামাদ ৩৯-৫০

১. চিত্রগ্রাহক সামাদ ২. নান্দনিক আলোকন শিল্পী সামাদ

তৃতীয় অধ্যায় : আবদুস সামাদ চলচ্চিত্র ৫১-৮৩

১. *সূর্য গ্রহণ* ও *সূর্য সংগ্রাম* ২. *শিরী ফরহাদ*

চতুর্থ অধ্যায় : চলচ্চিত্র শিক্ষক আবদুস সামাদ : পাঠদান ও শিক্ষায়তন সৃজন ৮৪-১১০

১.পাকিস্তান চলচ্চিত্র বিদ্যালয় ও ঢাকা ফিল্ম ইনস্টিটিউট ২. বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ ও ফিল্ম এ্যাপ্রিসিয়েশন কোর্স ৩. বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশন ও চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৪. ঢাকা ফিল্ম ক্লাব ও সের্গেই বন্দারচুক ফিল্ম ক্লাব ৫. ফিল্ম ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশ ৬. জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট ও চলচ্চিত্র বিষয়ক কোর্স ৭. ফিল্ম এন্ড মিডিয়া ডিপার্টমেন্ট, স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

পঞ্চম অধ্যায় : নির্বাচিত রচনা ও কথকতা সংকলন ১১১-১৭৫

১. চলচ্চিত্র, সংস্কৃতি ও ভাষা সম্পর্কিত রচনা : ১ক. পরিচালক আবদুস সামাদের চোখে সূর্য গ্রহণ ১খ. চলচ্চিত্র ও বিজ্ঞান ১গ. চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ ১ঘ. সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র ১ঙ. সংস্কৃতি ও ভাষা ১চ. গেরাসিম লেবেদেভ এবং সেতুবন্ধন ১ছ. WHY A FILM INSTITUTE ? ১জ. SURJYA SANGRAM (SUN RISES EVERYWHERE);

২. প্রকাশিত সাক্ষাৎকার : ২ক. চলচ্চিত্রকার এম. আবদুস সামাদ-এর সাথে কথোপকথন ২খ. আমার কথা ২গ. সমাজ সচেতন চলচ্চিত্রকার আবদুস সামাদ ২ঘ. নির্মাতা নির্মাণ সমিতি প্রসঙ্গে আবদুস সামাদ;

৩. শুভেচ্ছা কথন, স্মরণবক্তব্য : ৩ক. আর্কাইভের ক্রান্তিকাল ৩খ. কিছু কথা (চাষী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে) ৩গ. বন্ধু গোলাম মোস্তাফা (শ্রদ্ধাঞ্জলি) ৩ঘ. চলচ্চিত্রের কথা (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চলচ্চিত্র সংসদের অনুষ্ঠানের জন্য লিখিত বক্তব্য) ৩ঙ. মন্তব্য (চিত্রগ্রাহক মাসুদ-উর-রহমানের চলচ্চিত্রের কারিগরিমান গ্রন্থের জন্য শুভেচ্ছাবাণী।

ষষ্ঠ অধ্যায় : মূল্যায়ন ও মন্তব্য সংকলন ১৭৬-১৯৬

১. চলচ্চিত্রকার এম. এ. সামাদ - মহিউদ্দিন ফারুক
২. *সূর্য সংগ্রাম* ॥ বাণিজ্য-নিরপেক্ষ শিল্প সুষমা - গোলাম সারোয়ার
৩. *সূর্য সংগ্রাম* : একটি পরিচ্ছন্ন ছবি - অনুপম হায়াৎ
৪. ক্যামেরার জাদুকর এম. আবদুস সামাদ - শাহজাহান চৌধুরী
৫. চলচ্চিত্র সমালোচনা - স্বল্পবাক
৬. এম আবদুস সামাদ এবং তাঁর ফিল্ম ইনস্টিটিউট- মীর শামছুল আলম বাবু
৭. সামাদ ভাই আর নাই (স্মরণ)- আলম কোরেশী
৮. বিভিন্ন মন্তব্য

সপ্তম অধ্যায় : ব্যক্তি সামাদ-শিল্পী সামাদ ১৯৭-২০৮

ক. ব্যক্তি সামাদ-শিল্পী সামাদ

খ. সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জি : ১. কালপঞ্জি ২. চিত্রগ্রহণকৃত চলচ্চিত্রের তালিকা ৩. পরিচালিত চলচ্চিত্র ৪.স্বল্পদৈর্ঘ্য/প্রামাণ্যচিত্র ৫. টেলিভিশন নাটক ৬. প্রশিক্ষণ চলচ্চিত্র ৭. অভিনয় ৮. অসমাপ্ত চলচ্চিত্র ৯. রচিত চিত্রনাট্য ১০. পুরস্কার ও সম্মাননা (ক. চিত্রগ্রাহক হিসাবে প্রাপ্ত পুরস্কার খ. নির্মিত চলচ্চিত্রের পুরস্কার/সম্মাননা প্রাপ্তি গ. অন্যান্য পুরস্কার/সম্মাননা) ১১. সাংগঠনিক কর্ম ১২. রচনাপঞ্জি ১৩. মূল্যায়ন, মন্তব্য ইত্যাদি।

পরিশিষ্ট ২০৯-২১৪

১. ফিল্ম ফাইন্যান্সিং ব্যাংক(খসড়া);

২. ফিল্ম আর্কাইভে জমা দেয়া গ্রন্থ ও স্মারক-এর তালিকা।

সহায়ক গ্রন্থাবলী ২১৫-২১৬

আবদুস সামাদের এ্যালবাম ২১৭-২৫২

প্রাক কথন

আমার দেখা প্রথম সিনেমা সম্ভবত ময়নামতি। ঐ সিনেমা দেখি টংগী আনারকলি হলে এক মামার সাথে (মায়ের চাচাত ভাই) । তখন আমি ক্লাস থ্রির ছাত্র (১৯৬৯)। আমার বড় ভাই নূরে আলম বাবু আমার চেয়ে দুই ক্লাস উপরে পড়তো। দু'ভাইর সিনেমা দেখা চলতো পালা করে। স্কুলে যাওয়ার বাস ভাড়া (টংগী বাজার থেকে আজমপুর, উত্তরা ভাড়া ১০ পয়সা, হাফ ৫ পয়সা) বাঁচিয়ে একবারে ৫০ পয়সা জোগাড় করার ধৈর্য্য সইতো না (থার্ড ক্লাসের টিকেট ছিল ৫০ পয়সা)। তাই এক টিকেটে দু'জনে দেখতাম পালা করে। বিরতির পূর্ব পর্যন্ত একজন দেখে বেরিয়ে যেতাম, অন্যজন দেখতাম পরের অংশ। শো শেষে দু'জনে দুই অংশের গল্প বলে পুরো গল্প জোড়া লাগিয়ে বাড়ি ফিরতাম। অবশ্য হল গেইটের দারোয়ানের চোখ ফাঁকি দিয়ে মাঝে মধ্যে ঢুকতে পারলে পুরোটাই একসাথে দেখার সৌভাগ্য হতো। তবে কথা হলো কোনোভাবেই একটা সিনেমাও মিস্ করা যাবে না, ব্যাস। সিনেমা দেখার এই ধারা অব্যাহত ছিল কলেজে পড়া পর্যন্ত (১৯৮০)।

স্বাধীনার পর আমাদের সিনেমা দেখা দলের সদস্য সংখ্যা ছিল ৮ (তারেক, কমল, মতি, এমারত, ইলিয়াস, সোহরাব, মঞ্জু ও আমি)। প্রতি শুক্রবার (ছবি মুক্তির দিন) ক্লাস ছিল হাফ (সাপ্তাহিক ছুটি ছিল রোববার)। টিকেটের পয়সা একত্রিত করে প্রথম পিরিওডের পরই (১১ টার ক্লাস) তারেক ও কমলকে পাঠিয়ে দেয়া হতো হলে— যেন অবশ্যই টিকেট দেয়ার লাইনের প্রথমে থাকতে পারে। তখন দেখতাম সেকেন্ড ক্লাসে, এক টাকা টিকেট। সেকেন্ড ক্লাসের প্রথম সারির ক-১, ২... থেকে আমাদের টিকেট হওয়া চাই। তারেক কমল জামা খুলে খালি গায়ে, লুঙ্গি মালকোঁচা দিয়ে রীতিমত ঠেলাঠেলি-ধাক্কাধাক্কি করে ঘামে গন্ধে একাকার হয়ে টিকেট কেটে আনতো। বিনিময়ে আমরা ওদের দু'জনের পয়সা দিয়ে দিতাম।

কবে কি সিনেমা দেখতাম কত টাকা খরচ করে, তা লিখে রাখতাম ছোট্ট একটি পকেট নোটে; তাতে কেবলমাত্র সিনেমা দেখার হিসাবই লেখা হতো। সেভেন-এইটে পড়ার সময় থেকে ঢাকার সকল সিনেমা হল, বিডিআর গ্যারিশন, চৌরাস্তার উল্কা সিনেমা, মেশিন টুলস-এর গ্যারিশন—কোনোটাই বাদ যেত না— যদি না দেখা কোনো সিনেমা চলে। ঢাকার বড় বড় হলগুলিতে ইংরেজি সিনেমা, গ্যারিশনে ভারতীয় বাংলা ও উর্দু সিনেমা দেখা হতো বেশি। সিনেমা দেখার ভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছে তখনই। এছাড়া সাপ্তাহিক চিত্রালী ও সিনেমার জন্য সপ্তাহ শেষে ছটফট করা, ইত্তেফাকের সিনেমা বিজ্ঞাপনের পাতা কেটে ঘরের দেয়াল সাজানো—এগুলো সবই হয়ে উঠেছিল জীবনের অত্যাবশকীয় বিষয়।

টংগীতে নতুন সিনেমা আসতো মুক্তি পাওয়ার দ্বিতীয় সপ্তাহে। সে হিসাবে *সূর্য গ্রহণ* ও *সূর্য সংগ্রাম* মুক্তি প্রাপ্তির দ্বিতীয় সপ্তাহেই (যথাক্রমে ডিসেম্বর ৪র্থ সপ্তাহ ১৯৭৬ এবং এপ্রিল ৪র্থ সপ্তাহ ১৯৭৯) দেখেছি বলে ধারণা করছি। এছাড়া পরবর্তীকালে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সিনেমা দুটি দেখেছি বলে মনে পড়ে। জমির আইল, ট্রাক্টর—এরকম কিছু চিত্রকল্প সবসময় মাথার ভেতরে কাজ করতো। বহু দেখা সিনেমার মধ্যে উক্ত দু'টি যে আলাদা, সে বোধটুকু অন্তত ছিল বলে মনে

হচ্ছে। নইলে ২০০৪ সালে স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আবদুস সামাদের সাথে আলাপ করে এত পরিচিত আর আপন মনে হয়েছে কেন তাঁকে? বয়সের ব্যবধানে তিনি নিশ্চিত আমার পিতার বয়েসী। কিন্তু বন্ধু মনে হলো কেন ! যেন কতদিন ধরে তাঁর সাথে আলাপ পরিচয়, হৃদ্যতা। বুঝতে দেরি হয়নি ঐ সত্তর নিকটবর্তী বয়সের মানুষটি তরুণদের চেয়েও তরুণ। তাঁর শিক্ষা, জ্ঞান, নন্দনভাবনা, কথা বলার ধরণ, ব্যক্তিত্ব আমাকে আকর্ষণ করেছিল প্রবলভাবে। প্রবল ইচ্ছা সৃজিত হয়েছিল তাঁর সখ্য লাভের। ভেবেছিলাম বিভাগে (নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়) 'ফিল্ম স্টাডিজ' কোর্সের কয়েকটি ক্লাস নেওয়াব তাঁকে দিয়ে (আমি তখন বিভাগীয় সভাপতির দায়িত্বে ২০০৩-২০০৬)। সে আশা আর পূরণ হলো কই!

যখন জানা গেলো বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ আবদুস সামাদ বিষয়ক গবেষণা প্রস্তাব আহ্বান করেছে, তখনই মনস্থির হয়ে গেলো এ বিষয়ে কাজ করার। ধন্যবাদ ফিল্ম আর্কাইভকে, তাঁরা আমার 'চলচ্চিত্রশিল্পী আবদুস সামাদ : জীবন ও কর্ম' শীর্ষক গবেষণা প্রস্তাবটি অনুমোদন করেছে এবং গবেষণা ফেলো হিসাবে মনোনয়ন দিয়েছে আমাকে।

গবেষণার জন্য ফিল্ম আর্কাইভ থেকে একেবারে কম সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। সুতরাং খুবই শংকার মধ্যে ছিলাম। তথ্য-উপাত্ত কী করে জোগাড় করবো ঠিক বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আবদুস সামাদের পরিবার পরিজন সম্পর্কে কিছুই জানিনা আমি। অনেক ভেবে হবিগঞ্জ থেকে 'পথিকজন' নামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নানা বাঙালী মনীষীদের চিত্র ও সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সম্বলিত ১৪১৭ বাংলা সনের ক্যালেন্ডার ও স্যুভিনর সূত্রে পার্থ প্রতীমকে ফোন করি। ওদের ক্যালেন্ডারে আবদুস সামাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি আছে। সামাদের জন্মস্থান হবিগঞ্জ। পার্থ জানালো ঢাকায় আছে আবদুস সামাদের ছোটো ভাই এ মোবিন চৌধুরী দিলু ও সামাদের একমাত্র মেয়ে কবিতা। চন্দন দিলু ভাইর সাথে কথা বলে আমাকে তাঁর ফোন নম্বর দেয়। দিলু ভাইকে ফোন করলে আনন্দ প্রকাশপূর্বক অভয় দেন 'কোনো সমস্যা নাই, বাবু আছে; বাবুর কাছে সামাদ ভাইর সব পাবেন, সে আপনাকে সহযোগিতা করবে।' আমার বদ্ধ অর্গল দ্রুত খুলে যেতে থাকলো। দিলু ভাই বাবুর ফোন নম্বর দিলেন। ফোনে কথা বললাম বাবুর সাথে। সেও অভয় দিল, 'কোনো সমস্যা নাই, আপনি স্যারের ওপর কাজ করছেন। যতরকম সহযোগিতা লাগে আমি দেব। স্যারের সব কিছু আছে আমার কাছে'। বাস্তবেও তাই হলো। বাবু মানে মীর শামছুল আলম বাবু। সে পর্বতারোহী, আলোকচিত্রী ও চলচ্চিত্রকর্মী। পর্বতারোহণ তাঁর নেশা এবং আরোহণ ইচ্ছুকদের প্রশিক্ষণ দেয়া তার পেশা। ছবিও তুলে বেড়ায়। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই অদ্ভুত শ্রেণির মানুষের সংখ্যা অতি নগণ্য। বাবু ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত 'চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ কেন্দ্র'র প্রথম ও একমাত্র ব্যাচের শিক্ষার্থী। ঐ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক ছিলেন আবদুস সামাদ। সেই থেকে শিক্ষক সামাদের একান্ত অনুগত এবং জীবনের শেষ যাত্রা পর্যন্ত অনুগামী ছাত্র, বন্ধু, সংগ্রামের সৈনিক বাবু। বাবুর নিকট এম এ সামাদের ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেট, বিলাত যাওয়ার পাসপোর্ট, লন্ডন ফিল্ম স্কুলের সার্টিফিকেট, সকল পুরস্কার সনদপত্র, বিয়ের কোর্ট-দলিল ও কাবিন নামা, বিবাহ

বিচ্ছেদের দলিল, মৃত্যুর সনদপত্র—কী নেই! বাবু প্রায় সবই আমাকে ব্যবহার করতে দিয়েছে। আমার সঙ্গে ফিল্ম আর্কাইভের লাইব্রেরির পুরানো পত্রিকা ঘেঁটেছে, আমার সকল কাজে হয়েছে সঙ্গী। ওর সৌজন্যে প্রাপ্ত ছবি (photograph) দিয়ে একটি এ্যালবাম গ্রন্থের শেষে সংযুক্ত করা হয়েছে। বাবুকে অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। সালাম ও কৃতজ্ঞতা জানাই এ মবিন চৌধুরী দিলু, কবিতা সামাদসহ তাঁদের পারিবারিক সকল সদস্যকে। আর্কাইভের লাইব্রেরিয়ান জনাব মো. নজরুল ইসলাম এর সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

আমার তত্ত্বাধায়ক দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পনির্দেশক জনাব মহিউদ্দিন ফারুক। তিনি এখন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম এন্ড মিডিয়া ডিপার্টমেন্টের প্রধান। সদা কাজে ব্যস্ত জনাব ফারুক আন্তরিকভাবে আমার কাজটি তত্ত্বাবধান করতে চেয়েছেন। নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি লিপিবদ্ধ করে দিয়ে তাঁর সামাদ ভাইর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। মহিউদ্দিন ফারুককে তত্ত্বাবধায়ক হিসাবে পেয়ে আমি আনন্দিত। তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আর্কাইভের মহাপরিচালক কামরুন নাহার, পরিচালক মো. আবদুস সাত্তার মিয়াজী আন্তরিক ইচ্ছা ও আগ্রহ নিয়ে কাজ করছেন বলেই গত ক'বছরে শুরু হওয়া গবেষণা এবং প্রকাশনার ধারাটি অব্যাহতই শুধু নয় বেগবানও হয়েছে। আর্কাইভকে সমৃদ্ধ করে তোলার লক্ষ্যে এ অভিযাত্রা বেগবান হোক সফল হোক এই প্রত্যাশা করি।

নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের স্টোর কিপার মো. হাসমত আলী কেবলমাত্র অর্থগত কারণে নয়, ভালোবাসা ও হৃদিক টানে আমার সকল লেখা কম্পোজ করে দেয়। দোয়া করি সুস্থ ও সুন্দর জীবন যাপন করুক।

আমার বউ ফাহমিদা মল্লিক মিতা এবং একমাত্র পুত্র অংশুমান রশীদ আমাকে যেভাবে লালন পালন করে, তাতে আমার আরো অনেক কাজ করা দরকার। উচিৎ আরো আরো অনেক কিছু দেবার। ওরা ভালো থাকুক।

পরিশেষে, বক্ষ্যমাণ রচনাটি কতটা গবেষণা গ্রন্থ, কিংবা কতটা জীবনী গ্রন্থ হয়ে উঠেছে—তা নিয়ে নিশ্চিত ভাবেই তর্ক-বিতর্কের অবকাশ বিস্তর। কাজ করতে গিয়ে আবদুস সামাদের নিজের রচনা ও বক্তব্য এত বেশি পেয়েছি এবং সেগুলো এত সমৃদ্ধ যে আমার মনে হয়েছে এগুলোকে সামনে তুলে ধরাই হবে একটা বড় কাজ। তাঁর বিচিত্র ও বর্ণিল জীবন চর্যাকে রূপরেখা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে কতিপয় বাঁক নির্দেশনার মাধ্যমে। তাঁর যেসকল বিচিত্র সত্তা—চিত্রগ্রাহক, চিত্রপরিচালক, কাহিনিকার, চিত্রনাট্যকার, অভিনেতা, চলচ্চিত্র শিক্ষক, সংগঠক—সর্বোপরি একজন সত্যিকারের সাদা মনের আলোকিত সুন্দর মানুষ, সেগুলোকে কেবলমাত্র বর্ণনার মাধ্যমে পাঠকদের সামনে মেলে ধরতে পারলেই জানা যাবে আসল মানুষটির প্রকৃতি। সেই বিশ্বাস থেকে গঠিত হয়েছে বর্তমান রচনা 'চলচ্চিত্রশিল্পী আবদুস সামাদ : জীবন ও কর্ম'।

উল্লেখ্য, বিভিন্ন রচনা, আলোচনা-সমালোচনা, মন্তব্য, উদ্ধৃতি ইত্যাদিতে মূল রচয়িতা বা বক্তার ভাষা ও বানানরীতি যথাসম্ভব অক্ষুণ্ন রাখা হয়েছে। এসব রচনা-আলোচনা-প্রতিবেদনের বক্তব্য বা মন্তব্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব। আমরা তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত হয়ে তাঁদের বক্তব্য ও ভাষাকে রেখেছি অপরিবর্তিত।

আশা করা যায় এই গ্রন্থটি পাঠান্তে কোনো কোনো ঔৎসুক অনুরাগী পাঠক প্রবৃত্ত হবেন সম্পূর্ণতা দানে, বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ দূরীকরণ নিমিত্তে। সেই সুন্দর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ড. রশীদ হারুন
অধ্যাপক
নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
৩০ মে ২০১২
rashidharoonju@gmail.com

প্রথম অধ্যায়

ব্যক্তি জীবনের রূপরেখা

চলচ্চিত্র গ্রাহক, নির্মাতা এবং চলচ্চিত্র শিক্ষক— এই ত্রয়ী ভূমিকায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন আবদুস সামাদ। তবে তাঁর জাতীয় পর্যায়ের স্বীকৃতি রয়েছে চিত্রগ্রাহক হিসাবে। তিনি শ্রেষ্ঠ চিত্রগ্রাহক হিসাবে লাভ করেছেন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার ১৯৭৬। এছাড়া পেশাগত সহকর্মীদের সংগঠিত ও সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ঈর্ষণীয়। তদুপরি শিল্পমনস্ক, মননশীল, শুদ্ধচেতনার পজেটিভ চিন্তাধারার এই মানুষটি বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের এক অন্যন্য সম্পদে পরিণত হয়েছেন। তাঁর প্রয়াণের মধ্য দিয়ে তিনি যেন লাভ করেছেন নবজন্ম। মৃত্যুর পরই তো হয় মানুষের প্রকৃত মূল্যায়ন। আর এই মূল্যায়নের মাধ্যমেই বেঁচে থাকেন কীর্তি সৃজনকারী মানুষেরা। ঐ নক্ষত্রপুঞ্জিতে বিরাজমান শিল্পী আবদুস সামাদও জ্বলজ্বল করছেন তাঁর সৃষ্ট কর্মযজ্ঞের কিরণ ছটায়। আমরা বাধ্য হই ঐ কিরণছটার আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত হবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হতে। আমরা অভিযাত্রী হয়েছি বক্ষ্যমাণ অন্বেষণে চলচ্চিত্র শিল্পী আবদুস সামাদের বর্ণিল জীবনপ্রবাহ এবং তাঁর বিচিত্র কর্মপরিমণ্ডলের স্বরূপ চিহ্নিত করণের অভিপ্রায়ে।

১. শৈশব কৈশর ও পরিবার পরিজন

মো. আবদুস সামাদ চৌধুরী (Md. Abdus Samad Chowdhury) বা এম. আবদুস সামাদ অথবা এম এ সামাদ সাতষট্টি বৎসরের জীবনব্যাপ্তি এবং তেতাল্লিশ বৎসরের কর্মজীবনে মাত্র তিনটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্র নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করেছেন। ক্যামেরাবন্দী করেছেন প্রায় পঞ্চাশোর্ধ চলচ্চিত্র। রচনা করেছেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক চিত্রনাট্য-পাণ্ডুলিপি। সৃজন করেছেন চলচ্চিত্রকলা শিক্ষার একাধিক পাঠকেন্দ্র। প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে চলচ্চিত্র শিক্ষার বিভাগ— যা এদেশের জন্য অভূতপূর্ব। তদুপরি কত কাজ, কত স্বপ্নইনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তাঁর। রেখে গেছেন কতনা অনুগত ছাত্র, বন্ধু, ভক্ত, শিষ্য, কর্মী, সহযোদ্ধা আর অনুরাগী ঔৎসুক দর্শককূল।

চিন্তা-চেতনা, ভাবনা-দর্শন, আচার-আচরণ, যাপিত জীবন প্রণালী— সর্ব অর্থে একজন আধুনিক এবং চিরতরুণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী এই মনীষীর জন্ম ৮ জুলাই ১৯৩৭ সালে, তৎকালীন মহকুমা শহর হবিগঞ্জের পুরাতন মুন্সেফ কোয়াটারের পৈতৃক বাড়িতে। যদিও তাঁর ম্যাট্রিকুলেশন সার্টিফিকেটে জন্ম তারিখ দেয়া আছে ৩১ ডিসেম্বর ১৯৩৯। পারিবারিক নাম (ডাকনাম) লিচু। পিতা মো. আব্দুর নুর চৌধুরী ছিলেন উচ্চ পদস্থ পুলিশ কর্মকর্তা। গ্র্যাজুয়েট নুর চৌধুরী ১৯২৮ সালে পুলিশ বিভাগে যোগদান করেন এবং অবসর নেন ১৯৬৪ সালে এএসপি হিসাবে। মারা যান ১২এপ্রিল ১৯৭৮ সালে। মা হনুফা খাতুন গৃহিণী

হিসাবে জীবনযাপন করলেও ক্লাস সেভেন পর্যন্ত পড়াশোনা করেছিলেন। সেকালে এর চেয়ে বেশি লেখাপড়া করার সুযোগ ছিল না বড় শহরের বাইরেকার মেয়েদের। মা মারা যান ২৮ জুন ১৯৯৩-এ। অভিজাত মুসলিম পরিবারের সন্তান ছিলেন মা। হবিগঞ্জের জমিদার ছিল তাঁর পূর্বপুরুষ। আবদুস সামাদের পিতামহ আবদুর রহিম চৌধুরী ছিলেন পোস্টমাস্টার। তাঁরা তিন ভাই- আবদুর নুর চৌধুরী, আবদুর রউফ চৌধুরী ও আবদুর হাই চৌধুরী। পিতা-পিতামহের পূর্বপুরুষ হযরত শাহজালাল (রা.)-এর সঙ্গে যে তিনশতষাট জন আউলিয়া এদেশে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সিপাহশালার নাসিরউদ্দিন শাহ (রা.)-এর বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকার। পিতামহ-মাতামহর বন্ধুত্বের সূত্র ধরে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়িত হন আবদুস সামাদের বাবা-মা। আবদুস সামাদের পিতা-মাতার ঘরে তাঁরা ছয় ভাই সাত বোন জন্ম নিয়েছেন। তিন বোন ও দুই ভাই মারা যান শৈশবে। সবার বড় আবদুস সামাদ। পরের তিন বোন হামিদা নূর চৌধুরী লীলা, রাবেয়া খাতুন খেলা ও জায়েদা খাতুন মীরা। তারপর ভাই আবদুস সবুর চৌধুরী লইলু মুক্তিযুদ্ধ করেছেন প্রত্যক্ষ ভাবে। উল্লেখ্য আবদুস সামাদকৃত *সূর্য গ্রহণ* চলচ্চিত্রের মুক্তিযোদ্ধা রবি ও রাজিবের যে মনঃকষ্ট, যন্ত্রণা, হতাশা, স্বপ্নকথন তা মূলতঃ মুক্তিযোদ্ধা আবদুস সবুর চৌধুরীর যুদ্ধোত্তর কালের অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি ও যন্ত্রণার বহিঃচিত্র। এই বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রয়াণ ঘটে ২০০৬ সালে। তৃতীয় ভাই আবদুল মুকিত চৌধুরী মইনু আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী। পরের বোন রিজিয়া খাতুন অল্প বয়সেই মারা যান। পঞ্চম বোন সালেহা খাতুন আয়শা, চতুর্থ ও কনিষ্ঠ ভাই এম আবদুল মোবিন চৌধুরী দিলু একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করেন। জীবনের শেষের কয়েকটি বছর আবদুস সামাদ একমাত্র কন্যা কবিতা সামাদকে নিয়ে ছোট ভাই মোবিন চৌধুরীর সাথেই থাকতেন। অকৃতদার মোবিন চৌধুরী বড়ভাই আবদুস সামাদকে সম্বোধন এবং ভক্তি করতেন 'দাদা' বলে। বয়সের হিসাবে চব্বিশ বৎসরের ছোট হলেও মোবিন চৌধুরী তাঁর দাদাকে মান্য করতেন একাধারে বন্ধু, ফিলোসোফার, গুরু ও আদর্শ-ব্যক্তি হিসাবে।

মুসলিম অভিজাত পরিবারের ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হওয়া সত্ত্বেও মাতৃ বা পিতৃ বংশীয় কোনো দিকেই ধর্মীয় রীতিনীতি, পর্দা-সংস্কার ইত্যাদির বাড়াবাড়ি ছিল না। বলা যায় ঐতিহ্যবাহী অভিজাত মুসলিম উদার সাংস্কৃতিক পরিবেশ বিরাজমান ছিল পারিবারিক পরিমণ্ডলে। ইসলামের মৌলিক রীতি-নীতি সম্পর্কে সন্তানদের প্রতি দিক নির্দেশনা থাকলেও একটা মুক্ত মানসিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশেই বেড়ে উঠেছেন আবদুস সামাদ ও তাঁর ভাই-বোনরা। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক অনুরাগী পিতা পারিবারিক ও সামাজিক রীতিনীতি রক্ষা করে ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য সৃজনে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছাত্র জীবনে ভালো ফুটবল খেলতেন, পারতেন বাঁশি বাজাতে। মুসলিম অভিজাত ঐতিহ্য ও পুলিশ বিভাগে পিতা কর্মরত থাকা সত্ত্বেও আবদুস সামাদের পরিবারের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল ছিল গীত-সঙ্গীত সমৃদ্ধ। ঘরোয়া পরিবেশ ছিল আনন্দমুখর।

পিতার বদলীর চাকরির কারণে ভাই-বোনদের জন্ম হয়েছে নানা স্থানে; যেমন আবদুস সামাদের জন্ম হবিগঞ্জ শহরের পৈত্রিক ভিটায়, এক বোনের জন্ম কুমিল্লায়, এক জনের চট্টগ্রাম, এক বোনের কুমিল্লার বাঞ্ছারামপুরে ইত্যাদি। তবে আবদুস সামাদের শৈশব কেটেছে নিজ জেলা (বর্তমান,তৎকালীন মহকুমা) হবিগঞ্জে। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৫৫ সালে। বাবার ইচ্ছা ছেলেকে ডাক্তার বানাবেন। তাই উচ্চ মাধ্যমিকে সিলেট এম সি কলেজে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি করান ছেলেকে। কলেজ বাড়ি থেকে দূরে, বিজ্ঞান পড়তে ভালো লাগছে না; এ ছাড়া হোস্টেলের রান্নায় সাতকরা প্রতিদিন খেতে পছন্দ না। এতসব কারণে অতিষ্ট পিতা ছেলেকে এনে ভর্তি করেন হবিগঞ্জ বৃন্দাবন কলেজে। এখান থেকে মানবিক শাখায় আই এ পাশ করেন ১৯৫৭ সালে। ডাক্তারি পড়ানোর ইচ্ছা পূরণ হবার সম্ভাবনা নষ্ট হওয়ার পর বাবার নতুন ইচ্ছা ছেলেকে ব্যারিস্টারি পড়াবেন। এ ব্যাপারে ছেলেরও ছিল সম্মতি। ঐ বছরই লন্ডন পাড়ি দেন সামাদ ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য; নিজের এবং বাবা-মার ইচ্ছা পূরণের লক্ষ্যে।

স্কুল জীবনে জড়িত ছিলেন অভিনয়, গান-বাজনা ইত্যাদিতে। তিনি বলেন, 'মূলত এগুলোই ভালো লাগতো এখানেই উৎসাহ পেতাম। কখনো পরিশ্রান্ত হতাম না।' হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ছিল বিধায় অনেক বন্ধু-বান্ধব ছিল হিন্দু। বন্ধুদের পারিবারিক-সামাজিক পার্বণ, আচার অনুষ্ঠানে এম এ সামাদের অংশগ্রহণ ছিল নৈমত্তিক ব্যাপার। সমাজতান্ত্রিক সমাজ, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, দর্শন ও চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। কলেজে জড়িয়ে পড়েছিলেন বামধারার ছাত্র রাজনীতি ও আন্দোলনের সাথে। লব্ধ অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র-শিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা, সামাজিক-সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা এবং ব্যক্তিমানস গঠন ও যাপিত জীবন চর্যায় আবদুস সামাদকে বিপুলভাবে প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ করেছিল।

২. অধ্যয়ন/প্রস্তুতি পর্ব : চলচ্চিত্র শিক্ষা ও বিশ্ববীক্ষণ

১৯৫৭ সালে জনাব সামাদ লন্ডন গমণ করেন ব্যারিস্টারি পড়ার লক্ষ্যে। স্মর্তব্য ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল প্রাদেশিক আইন পরিষদে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' বিল পাশ হয়। উক্ত বিলটি অধিবেশনের শেষ দিনে তৎকালীন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান উত্থাপন করেন। প্রাদেশিক চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান নাজীর আহমদ, শিল্প দপ্তরের সচিব আসগর আলী শাহ ও শিল্প দপ্তরের উপ-সচিব আবুল খায়ের পূর্ব পাকিস্তানে একটি চলচ্চিত্র সংস্থা গঠনের বিষয়ে আলাপ করতে গেলে শেখ মুজিবুর রহমান 'চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা' প্রতিষ্ঠার বিলের খসড়া দু'দিনের মধ্যে প্রস্তুত করে দিতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাঁদের প্রস্তুতকৃত বিলটি সামান্য কিছু সংশোধনপূর্বক অধিবেশনে পাশ হয়। উল্লেখ্য, সে সময় প্রদেশের গর্ভনর ছিলেন শের এ বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান। ১৯৫৭ সালের ২৮ জুন চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থার পরিচালনা

বোর্ডের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সক্রিয়ভাবে কাজ শুরু হয় পরের বছর ১৯৫৮ সালে। আর ১৯৫৫ সালে, যে বছর আবদুস সামাদ ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন ঐ বৎসর আবদুস জব্বার খান চিত্রগ্রহণ সম্পন্ন করেন এদেশের প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র *মুখ ও মুখোশ*-এর। চলচ্চিত্রটি শুভমুক্তি লাভ করে ৩ আগস্ট ১৯৫৬-এ। নিয়তি যেন অলক্ষ্যে আবদুস সামাদের অনুবর্তী হয়ে ভবিষ্যতের ললাট লিখন তৈরি করছিল তাঁর চলচ্চিত্র শিল্পী জীবনের। উল্লেখ্য, একটি মহকুমা (তৎকালীন) শহরে থেকে কলেজে পড়ুয়া ছেলের পক্ষে দেশ-বিদেশের তাজা খবর পাওয়া বা রাখা সে সময়ে ছিল প্রায় দুঃসাধ্য। ঢাকায় এসে যখন লন্ডন যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন পেয়েছিলেন সিনেমা তৈরি হওয়া বা চালু হওয়ার কিছু বিচ্ছিন্ন খবরাখবর। সিনেমা বিষয়ক প্রথম সংবাদ প্রাপ্তির স্মৃতিচারণ প্রসঙ্গে তিনি এক মজার ঘটনার কথা বলেছেন। লন্ডন যাবার পাসপোর্ট তৈরির জন্য ছবি তুলতে গিয়েছিলেন নব নির্মিত ঢাকার নিউ মার্কেটের 'আক্স ফটোগ্রাফি স্টুডিও'তে। ছবি তোলার সময় তরুণ আবদুস সামাদের রক্তিম বর্ণের অভিজাত কান্তিময় সুদর্শন চেহারা ও গড়ন দেখে স্টুডিওর মালিক আখুনজাদা ফায়জুর রহমান বলেছিলেন, 'দেশে তো সিনেমা চালু হয়েছে। ইকবাল ফিল্মস নায়ক খুঁজছে, তুমি মামু একদম ফিট, যাবে নাকি?' বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ার রঙিন স্বপ্নে যে বিভোর, এমন প্রস্তাব শোনা বা গ্রাহ্য করার ফুসরৎ কই তার! এ যেন কোনো এক সিনেমারই দৃশ্য চিত্রায়ন— নায়ক ঐ কথায় কর্ণপাত না করে আড়াই হাজার টাকায় টিকেট সংগ্রহ করে ঘোড়ার গাড়িতে করে টগ্‌বগ্ টগ্‌বগ্ ধ্বনি তুলে ছুটে চলেছে তেজগাঁ 'ঢাকা বিমানবন্দর'-এর দিকে এবং ব্রিটিশ এয়ার ওয়েজের ৭০৭ বোয়িং উড়ে চলে মিশে গেল দূর আকাশে। অমনটাই ঘটেছিল সেদিন পরবর্তী কালের প্রতিষ্ঠিত সিনেমা শিল্পী আবদুস সামাদের জীবনে।

নিজের এবং পরিবারের স্বপ্ন পুরণের প্রত্যাশা নিয়ে বিপুল আগ্রহে ভর্তি হয়েছিলেন লন্ডনের লিংকনস ইন কলেজে। ছয়মাস ক্লাশ করলেন। কিন্তু মিলছে না কিছুতে মানসিক তৃপ্তি। আইনের নানা ধারা উপধারা মুখস্থ করা তাঁর ধাতে সইছিল না। লিংকনস ইন ছেড়ে ভর্তি হলেন চার্টার্ড একাউন্টেনসিতে। ব্যারিস্টারি পড়ার স্বপ্নের নিমজ্জন ঘটলো লেজার বুক আর ব্যালান্স শিট তৈরির এক ঘেয়ে চর্চার টেবিলে। বুকের ভেতরটা কেমন যেন হুহু করে, মাথার ভিতরে কোন এক বোধ কাজ করে যা তাঁকে শান্তি দেয় না, তৃপ্তি খুঁজে পান না কৃত কর্মে। হতাশার অদৃশ্য কীট তাঁর দেহ মনকে অনিচ্ছা অনাগ্রহের কালো সুতায় বাঁধতে লেগেছে। ওই সময় তাঁর বেশ কিছু আরব দেশীয় বন্ধু ছিল, যারা পড়তো লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনলজিতে। তাদের অনেকে ইংরেজি বুঝতো কম। বিদেশী চলচ্চিত্রের উপর থিসিস করতে হতো তাদের। সে কারণে ওরা দ্বারস্ত হতো সামাদের। সামাদও আন্তরিকতার সাথে তাদের ইংরেজি বোঝাতেন। এই সুবাদে ফিল্ম স্কুলের অধিকাংশ শিক্ষার্থীর সাথে সখ্য গড়ে ওঠে সামাদের। সে সময় তাঁর জীবনে আবার ঘটে এক কাকতালীয় ঘটনা (নাকি নিয়তি নির্ধারিত?)। একদিন আরব দেশীয় এক বন্ধুর অতি আগ্রহে গিয়ে হাজির হলেন লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম

টেকনিক-এ। বন্ধুটি ছিল ঐ ইনস্টিটিউটের ছাত্র। সেদিন দেখানো হবে সত্যজিৎ রায় কৃত চলচ্চিত্র *পথের পাঁচালী*। *পথের পাঁচালী*র মুক্তির কাল ১৯৫৫।

সেদিন লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক-এ *পথের পাঁচালী* প্রদর্শন এবং বিশ্লেষণমূলক আলোচনার আয়োজন ছিল এর ওপর। ইংল্যান্ডের প্রবাস জীবনে বাংলা সিনেমা এবং তাও *পথের পাঁচালী*— তরুণ সামাদের হৃদয়-মন নেচে উঠলো। উপন্যাসটি পড়া ছিল আগেই। পরম কৌতুহল আর উত্তেজনা নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে দেখেছিলেন সেদিন *পথের পাঁচালী* (সম্ভবত ঐটি তাঁর প্রথম বাংলা সিনেমা দেখা?)। প্রদর্শনোত্তর আলোচনায় ইনস্টিটিউটের পরিচালক *পথের পাঁচালী*তে দৃশ্যমান বিষয়বস্তুর আলোকে ব্যাখ্যা করছিলেন প্রাচ্য জীবন, দর্শন ও সংস্কৃতি বিষয়ে। একজন পাশ্চাত্য-শিল্প-তাত্ত্বিকের চোখ ও মনন দিয়ে প্রাচ্যের তথা ভারতবর্ষীয় জীবন দর্শন সংস্কৃতির বিশ্লেষণ প্রাচ্য সংস্কৃতির উত্তরাধিকার তরুণ শিক্ষার্থী এম আবদুস সামাদকে তৃপ্ত করতে পারে নি। চারিত্রিক ঋজুতা ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন তরুণ সামাদ পরিচালকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সাথে অনেক বিষয়ে একমত হতে পারছিলেন না। চলচ্চিত্রের পর্দায় দৃষ্ট বাংলার প্রকৃতি সমাজ ও মানুষের জীবনচর্যা সাতসমুদ্রের ওপারের মানুষের উপলব্ধিতে যথাযথ ধরা পড়ার কথাও নয়। হবিগঞ্জ ও সিলেটের অসমতল সবুজ প্রকৃতি, বিশাল হাওড়, প্রান্তর আর মেঘ-পাহাড়ের লুকোচুরি দেখে যে তরুণের বেড়ে ওঠা, *পথের পাঁচালী*'র গল্প ও বর্ণনা যার শৈশব-কৈশরের নকশি-মাঠ— তাঁর পক্ষে ঐ সাহেবি বিশ্লেষণে তৃপ্ত হবার কথা নয়। ইনস্টিটিউটের ছাত্র না হয়েও সামাদ সেদিন প্রাণের আবেগ দমন করতে না পেরে দাঁড়িয়ে প্রকাশ করেছিলেন চলচ্চিত্রে দৃষ্ট বাংলার চিত্ররূপ, উপন্যাসে পঠিত কথা দৃশ্যকাব্যের বাঙময় শিল্পরূপ এবং নিজের যাপিত জীবনে অভিজ্ঞতায় সঞ্চিত বাংলার শাশ্বত বর্ণিল বিচিত্র রূপ ও প্রাণঞ্জল মানুষদের কথা। বাগ্মীতায় পটু সামাদের আবেগ উচ্ছ্বাসে উদ্ভাসিত কথকতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শ্রবণ করেছিল হল ভর্তি শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীবৃন্দ। ইনস্টিটিউটের প্রিন্সিপাল রবার্ট ডানবার আলোচনা শেষে তাঁর কক্ষে দেখা করতে বললেন সামাদকে। তাঁরা পরস্পরকে চিনতেন না জানতেন না। সাক্ষাতে ডানবার বললেন— 'তুমি এখানে ভর্তি হয়ে যাও। আমার বিশ্বাস ভালো করবে।' সেদিনের বিষয়ে সামাদ জীবনের শেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন, 'রবার্ট ডানবারের কথাটি সপ্তাহ দুই ধরে আমাকে হন্ট করেছিলো; শেষে ভর্তি হয়ে গেলাম, সম্পূর্ণ আবেগপ্রবণ হয়ে, ভূতভবিষ্যৎ কিছুই জানিনা— কী হবে না হবে।'[১] বৃটিশ ফিল্ম ইনস্টিটিউট-এর 'দি লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক'-তে চলচ্চিত্রের নির্মাণ কৌশল বিষয়ক 'Course of Training in Motion Picture Production Technique' কোর্সে ভর্তি হলেন সামাদ।

স্যুট-কোট খুলে প্রথম দিনে ক্লাশরুমের মেঝে পরিষ্কার করা দিয়ে শুরু হয় চলচ্চিত্রের প্রাথমিক পাঠ। অভিজাত পরিবারের আদরের সন্তান হিসাবে বেড়ে ওঠা তরুণ সামাদ কিন্তু নানা দেশের সহপাঠীদের সাথে আনন্দের সাথেই সকাল ৮ টা থেকে রাত ১০ টা পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিচিত্র ও নতুন রীতির

পাঠাভ্যাস রপ্ত করেছিলেন। শিক্ষার সত্যিকারের আনন্দের সন্ধান যেন এত দিনে পেলেন। কিন্তু সংকট সৃষ্ট হয়েছে মাতৃভূমিতে। মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে সিনেমা বিষয়ে ভর্তি হয়েছে— এই দুঃসংবাদ শুধু যে ব্যারিস্টার ছেলের পিতা-মাতা হবার স্বপ্নকে বিনষ্ট করেছে তা নয়, আশংকা তৈরি হয়েছে সন্তান হারানোর। ঐ ম্লেচ্ছর দেশে সিনেমা নিয়ে পড়াশুনা করে কি ছেলের মাথা ঠিক থাকবে? আর যদিওবা পড়া শেষ করে দেশে ফেরে, তা হলেই বা করবেটা কী! কেবলমাত্র যে পিতা-মাতার মন ভেঙেছে তা নয়, হবিগঞ্জের ছোট্ট শহরেও সৃষ্টি হয়েছে আলোড়ন। পীর-পয়গম্বর বংশের পুলিশ কর্মকর্তার সন্তান সিনেমা পড়ছে বিলাতে, সর্বনাশের কী আর বাকি রইল! বন্ধ হয়ে গেল পিতার পাঠানো পড়াশোনার খরচ। আর্থিক সংকটে সিনেমা-ছাত্রের ত্রাহি অবস্থা। উপায় হিসাবে একটি সিলেটি রেস্টুরেন্টে পার্টাইম বেয়ারার চাকরি করে চা-বিস্কুট খেয়ে এক বছর নিজেই নিজের খরচ চালিয়ে অব্যাহত রেখেছিলেন সিনেমা অধ্যয়ন। ফলও পেয়েছেন। সিলেটি ঐ রেস্টুরেন্টের নাম Green Mass, মালিক আবদুস সামাদের মায়ের দূর সম্পর্কের ভাই ছানু মিয়া। লন্ডনে গিয়ে সামাদ প্রথম তাঁর আশ্রয়ে ওঠেন। হোসেন শহীদ সোহরোওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ জাতীয় নেতারা লন্ডনে গেলে ঐ রেস্টুরেন্টে থাকতেন। একবার বঙ্গবন্ধুর ফান্ডে আবদুস সামাদ ২০০ পাউন্ড দিয়েছিলেন।

বর্ষ-চূড়ান্ত পরীক্ষায় 'ডিস্টিংশন' গ্রেড লাভ করে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ('দি লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক'-এর ফলাফলের গ্রেড ছিল চারটি- DISTINCTION, FIRST CLASS, GOOD AND PASS.) এই ফলাফলের কারণে প্রিন্সিপাল ডানবার একটি স্কলারশিপের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এই স্কলারশিপের সুবাদে পরবর্তী তিন বৎসর আবদুস সামাদ নিশ্চিন্তে নিবিষ্টভাবে পাঠ নিয়েছেন চলচ্চিত্রের নানা কৌশল সম্পর্কে। স্বদেশে পরিবারের লোকজনের মনেও এসেছিল স্বস্তি। পারিবারিক পীর খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ (র.) অভয় দিয়েছিলেন; 'লিচু বিপথে যাবে না। তাকে নিয়ে দুঃশ্চিন্তা করতে হবে না। সে নিজের এবং দশের মুখ উজ্জ্বল করবে।' নিশ্চিত হলো পরিবার, পুনরায় চালু করেছিলেন খরচের অর্থ প্রেরণ। পিতা-মাতার আশীর্বাদ, প্রশংসা ও অর্থ— আবদুস সামাদকে নতুন প্রেরণা যুগিয়েছিল প্রবাসে চলচ্চিত্র শিক্ষার জীবনে।

চলচ্চিত্র বিষয়ে অধ্যয়ন করতে গিয়ে তাঁকে পড়তে হয়েছে পৃথিবী ও মানব জাতির ইতিহাস, বিশ্ব শিল্পসংস্কৃতি, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, চিত্রকলা, সংগীত, অভিনয়, প্রযুক্তি ইত্যাদি সম্পর্কে। বিজ্ঞানের নবতর আবিষ্কার, প্রযুক্তি ও বিবিধ শিল্পকলার সমন্বিত অভূতপূর্ব নবীনশিল্প সিনেমা সম্পর্কে আবদুস সামাদের শিক্ষার ভীতটি তখনই তৈরি হয়েছিল। তাঁর নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল সবকিছু। তাঁর স্বীকার, 'বোঝা ও উপলব্ধি— সবটাই যেন বিজ্ঞানসম্মত হতো। একই ধারাবাহিকতায় চলচ্চিত্র মাধ্যমটিও আমার কাছে সহজবোধ্য ও সব ধরনের সংস্কারমুক্ত হয়ে উঠেছে।'[২] 'দি লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক'-এ শিক্ষক হিসাবে

সামাদ পেয়েছিলেন রবার্ট ডানভার (প্রিন্সিপাল), মারিউস স্ট্যানটন, হেলগা, ক্রানস্টন, পিটার রিগ, পিটার হ্যানসী, মিসেস ডি. রাউনডেল (সেক্রেটারি)। অতিথি শিক্ষক হিসাবে ছিলেন ডেভিড লীন ও কার্ল ফোরম্যান। বিদ্যালয়ের পাঠক্রমের বিন্যাস অনুসারে প্রথম বৎসর ছিল সমন্বিত বিশেষায়িত পাঠ (Specialist subject)। এম আবদুস সামাদের বিশেষায়িত বিষয় ছিল 'আলোকন ও চিত্রগ্রাহক' (Lighting-Cameraman)। চিত্রগ্রহণ বিষয়ে অধ্যয়নকালে শিক্ষার্থীকে বেশকিছু চলচ্চিত্রের চিত্রগ্রহণের সাথে শিক্ষানবিশ হিসাবে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক। এছাড়া একটি পূর্ণাঙ্গ চলচ্চিত্রের নির্মাণ পর্বে সম্পৃক্ত থেকে সম্পন্ন করতে হয় ইন্টার্নিশিপ এবং প্রস্তুত করে জমা দিতে হয় একটি ফিল্ড রিপোর্ট। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে নির্ণীত হয় চূড়ান্ত ফলাফল। আবদুস সামাদ শিক্ষানবিশী সহকারি হিসাবে চিত্রগ্রহণের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন বিশ্বখ্যাত নির্মাতা ক্যারেল রীডের চলচ্চিত্র *Saturday Night And Sunday Morning*-এ। ৮৯ মিনিটের রঙিন এই চলচ্চিত্রে তিনি চিত্রগ্রাহক প্রেডি ফ্যান্সিস-এর সহকারি হিসাবে শিক্ষানবিশী চিত্রগ্রাহক ছিলেন। উল্লেখ্য, এ্যালবার্ট কেনি, সার্লি এ্যান ফেল্ড, র‍্যাচেল রবার্ট, হেলদা বাকার প্রমুখ অভিনীত চলচ্চিত্রটি 'বেস্ট ফিল্ম' হিসাবে বাফটা (BAFFTA) পুরস্কার লাভ করেছিল। চলচ্চিত্রটি সিনেমা হলে মুক্তি পেয়েছে ১৯৬০ সালের নভেম্বর। অন্যান্য নির্মাতার *Thirty Nine Steep* (পুনঃ নির্মিত ১৯৫৯), *Yesterday Today And Tomorrow* প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও কিছু কাজ করেছেন সামাদ। এছাড়া অংশবিশেষ চিত্রগ্রহণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্রের। উল্লেখ্য, লন্ডন স্কুল অব ফিল্ম টেকনিক-এর অন্যতম শিক্ষক ছিলেন ডেভিড লীন। লীন আবদুস সামাদের প্রিয় শিক্ষকদের একজন। সামাদ ইন্টার্নি হিসাবে কাজ করেছেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ভিত্তি করে নির্মিত লি থমসন পরিচালিত অস্কার পুরস্কার বিজয়ী চলচ্চিত্র *Guns of Navaron*-এর সাথে এবং প্রস্তুত করেছেন রিপোর্ট পেপার। কলম্বিয়া পিকচার্স পরিবেশিত এই চলচ্চিত্রের প্রযোজক কার্ল ফোরম্যান ছিলেন আবদুস সামাদের শিক্ষক। ১৯৫৭ সালে স্টটিকা থ্রিলার লেখক এলিস্টার ম্যাকলেন লিখিত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গ্রিক দ্বীপপুঞ্জে শত্রু বাহিনীর কামান ধ্বংসের কমান্ডো অভিযান নিয়ে রচিত উপন্যাসের চলচ্চিত্ররূপ *দি গানস অব নাভারন*। আবদুস সামাদ ছিলেন এই চলচ্চিত্রের শিক্ষানবিশী চিত্রগ্রাহক। চলচ্চিত্রটির মূল চিত্রগ্রাহক ছিলেন অসওয়াল্ড মরিস, সম্পাদক এ্যালেন অসবিস্টন। গেগরি প্যাক, এ্যান্থনি কুইন, ডেভিড নেভিন, স্ট্যানসি বাকার, জেমস ডারেন, পিটার গ্রন্ট প্রমুখ অভিনীত এই চলচ্চিত্রের বহিঃদৃশ্যের চিত্রায়ন হয়েছিল গ্রিসের রেডিস আইল্যান্ড, মাল্টা, পালমারিয়া, লিগিরন সাগর প্রভৃতি স্থানে। ইনডোর চিত্রগ্রহণ হয়েছে লন্ডনে স্টুডিওতে। স্মরণীয় যে, বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে গোল্ডেন গ্লোব এবং স্পেশাল এফেক্ট বিষয়ে অস্কার পাওয়া এই চলচ্চিত্রটি আরও পাঁচটি বিভাগে অস্কার নমিনেশন পেয়েছিল। ২২ জুন ১৯৬১-তে মুক্তি পাওয়া রঙিন চলচ্চিত্রটির স্থায়িত্বকাল ১৫৮ মিনিট। বাজেট ছিল ৬ মিলিয়ন পাউন্ড।

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ-এর কতিপয় প্রকাশনা

০১। বাংলাদেশের শিশুতোষ চলচ্চিত্র : একটি সমাজতাত্ত্বিক সমীক্ষা : তপতী বর্মন ও ইমরান ফিরদাউস, ঢাকা, ২০০৯।

০২। **Women on Screen : Representing Women by Women in Bangladesh Cinema, Bikash Ch. Bhowmick, Dhaka, 2009.**

০৩। চলচ্চিত্রের গানে ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : তপন বাগচী, ২০১০

০৪। মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ.কে.এম. আব্দুর রউফ, স্মারক গ্রন্থ, ঢাকা, ২০১১।

০৫। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র : অনুপম হায়াৎ, ঢাকা, ২০১১।

০৬। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার পটভূমি পর্যালোচনা : মো: রফিকুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।

০৭। বাংলাদেশের লোককাহিনীভিত্তিক চলচ্চিত্রে লোকজীবনের উপস্থাপনা : ড. তপন বাগচী, ঢাকা, ২০১১।

০৮। আমাদের চলচ্চিত্র : মো: ফখরুল আলম, ঢাকা, ২০১১।

০৯। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে শিশুর উপস্থাপন : শিশুতোষ মনোভঙ্গির নৈতিক ও শৈল্পিক পটভূমি পর্যালোচনা : ড. মো: আমিনুল ইসলাম, ঢাকা, ২০১১।

১০। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ পরিচিতি : ঢাকা, ২০১১।

১১। চলচ্চিত্রকার সালাহউদ্দিন : হারুনর রশীদ, ঢাকা, ২০১১।

১২। সুমিতা দেবী : অবায় রহমান, ঢাকা, ২০১১।

১৩। উদয়ন চৌধুরী : সুহৃদ জাহাঙ্গীর, ঢাকা, ২০১১।

১৪। চলচ্চিত্রকার বাদল রহমান: জীবন ও কর্ম
আবু সাইদ মোঃ মেহেদী হাসান, ২০১১।

১৫। চলচ্চিত্র শিল্পী আবদুস সামাদ জীবন ও কর্ম
অধ্যাপক ড. রশীদ হারুন, ২০১১

১৬। মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রে নারী নির্মাণ
ড. কাবেরী গায়েন, ২০১১

১৭। **"Digital Filmmaking in Bangladesh: Trends, Problems and Potentials"** -Fahmidul Haq, 2011

১৮। বাংলাদেশের জনপ্রিয় ধারার চলচ্চিত্র ও সিনে সাংবাদিকতার আন্তঃপ্রভাব -অনিতি ফাল্গুনী গায়েন, হুমায়রা বিলকিস

১৯। বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভের ২৫ বছর রজতজয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ

বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ

বেতার ভবন, ৩য় তলা, ১২১ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, শাহবাগ, ঢাকা-১০০০